Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.202-210
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সুন্দরবনের ধর্মসমণ্বয়ী দেবদেবী ও নারী

পার্থ প্রতিম হালদার

গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত

Abstract:

Sundarbans folk deity ideas have become predominant based on favorable or unfavorable environment for human survival. That is, people have become dependent on all these gods to live healthy and beautiful. Believed in all these worldly gods. Water jungle, various rivers of Sundarbans, canal bill, insects, moths, the sea, besides snakes, crocodiles, tigers, supernatural dangers, storms, floods, earthquakes, heavy rains, lack of rains, cholera, dysentery, spring etc. either people Banabibi or Narayani Devi is worshiped to collect wood wax honey from the forest. Their nests are usually along the river banks. On the banks of the river, you can see the undergrowth of Aswattha, Bel, Pakur, Shaora trees. People of both communities worship Banabibi and Narayani Devi. Because Narayani's vehicle is a lion and Banabibi's vehicle is a tiger. So these two goddesses protect the people here from the ferocious beasts of the Sundarbans. But the most surprising thing is that even living in such a hostile environment like the Sundarbans (i.e. where crocodiles attack tigers in the water), people still dream of survival. Various people have dreamed of survival by believing in God. In other words, to put it simply, people started worshiping all these folk gods to get rid of the hostile environment by Sundarban water jungle, tiger snake crocodile etc. But not only that people worshiped these gods to get rid of all these wild beasts or water jungles, people worshiped these gods to get rid of various diseases and diseases, for good wishes. Moreover, to get rid of the nuisance of ghosts or metaphysical or supernatural dangers, our people here believe that by worshiping all these gods and goddesses, you can get rid of the hostile environment. Liberation can also be obtained from various dangers.

The people of South Twenty-four Parganas district have resorted to these gods to get rid of various dangers like, fear of tigers while collecting honey in the forest, fear of poisonous snakes in the forest area, fear of crocodiles in the water etc. That is why all these gods and goddesses are not worshiped according to any religious rules. All these gods and goddesses are worshiped only to get rid of danger. But let's say one thing in this context, the worship of God and Goddess is not only done by people of Hindu religion. From this point of view, our district is independent from other districts. Because here we worship different gods and goddesses by people of both Hindu-Muslim communities. As a result, we can see a very beautiful image of communal harmony here. . In other words, a mixed culture can be

observed in our folk society even in terms of religion. That is why an influence of mixed culture is noticed in our imagination of gods and goddesses. In this context, the names of deities like Banbibi, Olabibi, Barapir Saheb, Manikpir, Bamun Gazi etc. can be mentioned. Again, various songs and rhymes can be heard based on these folk deities. For example, Panchu Tagore's turn, Ban Bibi's turn, Baba Tagore's turn, Kanu Ray's song, Dakshin Ray's song, also Shiva's gajan, Ghentu songs are there.

Keywords: Religious gods, Goddesses, Banabibi, Narayani, Hindu religion, Communal harmony, Mixed culture, Folk society.

মানুষের বাঁচার অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের লোকদেবতা ভাবনাগুলোর প্রাধান্য ঘটেছে। অর্থাৎ সুস্থ সুন্দরভাবে বাঁচতে চেয়ে মানুষ এই সমস্ত দেবতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বিশ্বাস করেছে এই সমস্ত লৌকিক দেবতাকে। জল জঙ্গল, সুন্দরবনের নানান নদনদী, খাল বিল, কীট পতঙ্গ, সমুদ্র এগুলো থেকেও রক্ষা পেতে এছাড়া সাপ, কুমীর, বাঘ, আধিদৈবিক বিপদ, ঝড় ঝঞ্ঝা, বন্যা ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কলেরা আমাশয়, বসন্ত প্রভৃতি থেকে মুক্তি পেতে এই সমস্ত দেবদেবীর শরনাপন্ন হয় মানুষ। জঙ্গল থেকে কাঠ মোম মধু সংগ্রহ করতে তাই বনবিবি বা নারায়ণী দেবীর পুজো করছে। এদের থান গুলোও সাধারণোত নদী তীরবর্তী। নদী তীরবর্তী বট - অশ্বত্থ, বেল, পাকুড়, শ্যাওড়া গাছের নীচে দেখতে পাওয়া যায়। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ বনবিবি ও নারায়ণী দেবীকে পুজো করে। কারণ নারায়ণীর বাহন হল সিংহ আর বনবিবির বাহন বাঘ। তাই এই দুই দেবী সুন্দরবনের হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের থেকে এখানকার মানুষদেরকে রক্ষা করে। কিন্তু সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হল, সুন্দরবনের মত এমন প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস করেও (অর্থাৎ যেখানে জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ) এমন পরিস্থিতিতে বসবাস করেও মানুষ কিন্তু বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে। বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে বিভিন্ন লোক দেবতার প্রতি বিশ্বাস রেখে। অর্থাৎ সহজ করে বললে, মানুষ এই সমস্ত লোকদেবতার পুজো করতে শুরু করেছিল সুন্দরবনের জল জঙ্গল, বাঘ সাপ কুমীর প্রভৃতির দ্বারা প্রতিকূল পরিবেশের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। তবে শুধু যে এই সমস্ত হিংস্র জন্তু জানোয়ার বা জল জঙ্গলের থেকে মুক্তির জন্য মানুষ এসব দেবতার পুজো করত তা নয়, মানুষ এসব দেবতার পূজো করত বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, মঙ্গল কামনার জন্য। তাছাড়া ভূতের উপদ্রব থেকে বা আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আমাদের এখানকার মানুষের বিশ্বাস এই সমস্ত দেব দেবীকে আরাধনা করলে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। মুক্তি পাওয়া যেতে পারে বিভিন্ন বিপদ আপদ থেকেও। বিভিন্ন বিপদ আপদ বলতে যেমন, জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক সময় বাঘের ভয় থাকত, জঙ্গল এলাকায় বিষাক্ত সাপের ভয়, জলে কুমীরের ভয় - প্রভৃতি বিপদ থেকে মুক্তি পেতে এই সমস্ত দেবতার শরণাপন্ন হয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মানুষেরা। যে কারণে কোন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে এই সমস্ত দেব দেবীর পুজো হয় না। এই সমস্ত দেব দেবীর পুজো কেবলমাত্র বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, দেব দেবীর পুজো বলে যে শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের মানুষ করে থাকে তা নয়। এদিক থেকে আমাদের জেলা স্বতন্ত্র অন্যান্য জেলা থেকে। কারণ আমাদের এখানে বিভিন্ন দেব দেবীর পুজো হিন্দু - মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ করে থাকে। ফলে খুব সুন্দর একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি্র চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে আমাদের এখানে। অর্থাৎ আমাদের লোকসমাজে ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও একটা মিশ্র সংস্কৃতি লক্ষ করা যায়। সে কারণে আমাদের দেবদেবীর কল্পনাতে মিশ্র সংস্কৃতির একটা প্রভাব লক্ষ্য

করা গেছে। এ প্রসঙ্গে বনবিবি, ওলাবিবি, বড়পীর সাহেব, মানিকপী, বামুন গাজী প্রভৃতি দেবদেবীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার এই সমস্ত লোকদেবতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পালাগান, ছড়া এগুলোও শুনতে পাওয়া যায়। উদাহারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, পাঁচু ঠাকুরের পালা, বনবিবির পালা, বাবা ঠাকুরের পালা, কানু রায়ের গান, দক্ষিণ রায়ের গান, এছাড়াও শিবের গাজন, ঘেঁটু গান গুলো তো আছেই।

বনবিবি

আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ প্রান্তে বা সুন্দরবন অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন বনবিবি। মনসা বা চন্ডীর মতো তিনি উগ্র বা ভয়ঙ্করী নয়। প্রতিহিংসা তাঁর মধ্যে নেই। তিনি শান্ত, সৌম্য, ভক্ত বৎসল, দয়াময়ী ও লাবণ্যময়ী প্রকৃতির। তিনি অরণ্যের দেবী বা অরণ্যের বিবি। মায়াশক্তির দ্বারা তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারেন। তিনি ভক্তকে সবসময় রক্ষা করেছেন। তাছাড়া তিনি দক্ষিণরায়কে ক্ষমা করেছেন, নারায়ণীর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে নারায়ণীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন, ধনামৌলের সঙ্গে বিবাদে না গিয়ে ধনামৌলের কন্যা চম্পার সাথে দুখের বিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর অপার দয়া দাক্ষিণ্যে সবাই ধন্য হয়েছে। বিপদ আপদ থেকে বেঁচেছে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ। তাই আমাদের কাছে তিনি শুধু বনবিবি দেবী নয়, তিনি আমাদের মা, তিনি আমাদের রক্ষাকারী দেবী। মুসলিমদের ক্ষেত্রে তিনি অরণ্যের বিবি আর হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে তিনি বিবিমা। তবে সবার কাছে তিনি বিপন্ন - প্রাণ রক্ষাকর্ত্রী দেবী। তাই বনে বা জঙ্গলে যারা যখন বিপদে পড়েন তারা সবাই এই মায়ের স্মরণ করেন। হিন্দু - মুসলিম নির্বিশেষে সবাই তাঁকে স্মরণ করেন। এই দেবীকে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ পুজো করে থাকেন। সাধারণত জঙ্গলের মধ্যে নিরাপদে কাজ করার জন্য এই দেবীর আরাধনা করা হয়ে থাকে। তবে হিন্দু মুসলিম সমাজে দেবীর অলঙ্করণ বা পোশাক একটু আলাদা হয়ে থাকে। যেমন মুসলিম সমাজের বনবিবি দেবীর ক্ষেত্রে - মাথায় টুপি যা বন্য লতাপাতা দিয়ে আঁকা হয়। গলায় হার, পরিধানে ঘাগরা পাজামা, পায়ে জুতো, পাতলা ওড়না, চুলে বিনুনি, মাথায় টিকলি, গলায় বনফুলের মালা এগুলো দেখতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে হিন্দু সমাজে বনবিবি দেবীর মাথায় মুকুট, গলায় হার, বনফুলের মালা, কোলে একটা শিশু, বাঘের উপর উপবিষ্ট থাকাতে দেখা যায়। অন্যদিকে মুসলিম সমাজের বনবিবির বাহন হিসেবে অনেক সময় মুরগির উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। তবে এই বিবি মায়ের পুজো কোন সময় থেকে আমাদের লোকসমাজে শুরু হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এটা ঠিক, বিবি মায়ের পুজো প্রাচীন সুসভ্য মানুষের এক ঐতিহ্যবাহী পুজো। এই পুজোর সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পুজোর অস্তিত্বগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বনবিবি, নয়বিবি, সাতবিবি, ওলাবিবি যা-ই বলি না কেন সবই আমাদের সমাজে বিবিমা বলে পরিচিত। এমনকী এই সমস্ত বিবি মা কে কেন্দ্র করে নানান পালাগান প্রচলিত আছে। হিন্দু সমাজের অনেকেই এই বনবিবি দেবীকে বনচন্ডী, বনদুর্গা, অরণ্যদেবী, বনষষ্ঠী, বিশালাক্ষীও বলে থাকেন। তবে যে নামেই তিনি পরিচিত হয়ে উঠুক না কেন, জীবন - জীবিকার জন্য যারা সুন্দরবনের সাথে যুক্ত তাঁরা এই দেবীর প্রধান সেবক। বনবিবির প্রধান সেবকের মধ্যে বা প্রধান ভক্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, জেলে, মৌলে, কাঠুরিয়া, বাউলে প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু বনবিবির পুজোর কোন নির্দিষ্ট তারিখ থাকে না। বছরেরব যে কোন একটি সময়ে পুজো করা হয়। কারণ এর মূল উদ্দেশ্য বন জঙ্গলে নানা বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া। তাই বনে বা জঙ্গলে শিকারে যাওয়ার আগে বনবিবি দেবীর পুজো করা হয়ে থাকে। আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে বিবি মায়ের অনেক থান রয়েছে। তবে সব থানে যে দেবীর মূর্তি থাকে তা নয়। কোথাও কোথাও মূর্তি ছাড়াই মাটির বেদীর উপর বা ইঁটের বেদীর উপর কাদার তাল

রেখে পুজো করা হয়। পুজো করা হয় ফুল, দুর্বাঘাস ইত্যাদি দিয়ে। পুজো উপলক্ষে আমাদের জেলার বিভিন্ন স্থানে মেলা বসতেও দেখা গেছে। যেমন জয়নগরের মৈপিঠেও প্রতি বছর মেলা বসে।

আমাদের জেলায় দুই ধরণের বনবিবি পুজো হয়। একটি জঙ্গলে পুজো, আরেকটি পল্লীতে পুজো। তবে এটা ঠিক, জঙ্গলের পুজোর তুলনায় পল্লীর পুজোতে আড়ম্বর বেশি থাকে। কিন্তু জঙ্গলের পুজোর ক্ষেত্রে ভক্তিভাব বেশি দেখতে পাওয়া যায়। আর এই ভক্তিভাব কিন্তু পল্লীর পুজোতে লক্ষ্য করা যায় না। কারণ পল্লীর পুজোতে মেলা বসে, আড়ম্বর হয়। অন্যদিকে জঙ্গলের পুজো আড়ম্বরের জন্য নয়। এখানে প্রাণের দায়ে মানুষ পুজো করেন। তাই জঙ্গলের পুজোতে একটুও অনাচার হয় না। তাছাড়া যারা জঙ্গলে পুজো করেন, তাঁরা জঙ্গলে যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে থেকে খুব শুদ্ধভাবে চলাফেরা করেন। যেমন – স্ত্রী সংসর্গ না করা, বাসি কাপড় না পরা, ময়লা কাপড় না পরা ইত্যাদি। অর্থাৎ খুব শুদ্ধভাবে থাকতে তাঁরা চেষ্টা করেন। এমনকী জঙ্গলে যাওয়ার আগে ভক্তিভরে বাড়িতে বনবিবির পুজো করে তবেই ঘর থেকে বের হন। জঙ্গলে যাওয়ার পর আবার পুজো করেন। এমনকী জঙ্গল থেকে ফেরার পথে বা জঙ্গলে গিয়ে কাঠ মধু সংগ্রহ করে ফেরার সময়তেও আবার পুজো করেন। তাছাড়া বাড়ির লোকেরা যে কয়েকদিন জঙ্গলে থাকে সেই কয়েকটা দিন অনেক নিয়ম কানুন মেনে চলে বাড়ির মেয়েরা। মেনে চলে নানান সংস্কার। যেমন – সিঁদুর না পরা, আলতা না পরা, আমিষ না খাওয়া, বাড়িতে প্রতিদিন বিবিমায়ের পুজো করা ইত্যাদি।। অন্যদিকে যারা জঙ্গলে যায় তাঁরাও জঙ্গলে গিয়ে নানান ধর্মাচরণ পালন করেন। যেমন – জঙ্গলে গিয়ে বিবিমায়ের উদ্দেশ্যে মোরগ ছেড়ে দেয়। তারপর বাড়িতে গিয়ে খুব ভাল করে বিবি মায়ের পুজো করে থাকে। কারণ বিবি মায়ের পুজোতে কোন প্রকার অনাচার হলে মহাবিপদ। অনাচার হলে বাঘের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার আর কোন উপায় থাকে না। তাই বাঘের কবল থেকে বাঁচতে বিবি মায়ের পুজোর সাথে সাথে বিবিমায়ের মাহাত্ম্য সূচক নানান মন্ত্র উচ্চারিত করতে থাকেন। ক্ষেত্র গবেষণায় মৈপিঠের বাসিন্দা তথা নৌকার মাঝি সমীর মোল্লার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার এখানে মেলা হয়। তবে সেই সময় যাতে বিবিমায়ের থানের মধ্যে বাঘ প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য জাল ঘেরা থাকে। পাহারায় থাকে অনেক পুলিশ প্রশাসন। তিনি আরও বলেছেন, 'আমরা অনেকবার জঙ্গলে গেছি। কাঠ কাটতে গেছি, জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গেছি। নৌকা নিয়ে গিয়ে নদীতে মাছ ধরেছিও বহু বার। তাই কতবার যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তার নেই ঠিক। কারণ এখানে জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ। তবুও বনবিবির আশীর্বাদে, আল্লার আশীর্বাদে আমদের কিছু হয় নি। নসিব জোরে ফিরে এসেছি বারবার। তবে জঙ্গলে যাওয়ার আগে আমরা আমাদের গ্রামের এই পল্লীর থানতে মায়ের পুজো দিয়ে জঙ্গলে যাই। জঙ্গলে গিয়ে আবার মায়ের পুজো করি। তবে একটু সতর্ক থাকতেই হয়। নাহলে বিপদ কোন সময় যে এসে পড়বে তা কেউ বলতে পারে না। জঙ্গল থেকে ফেরার সময় জঙ্গলে মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে আসি। এই তো সামনে আষাঢ় মাসে মাছ ধরতে নদীতে যাব। আপনিও আসবেন। নৌকাতে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করা যাবে।'[১] মৈপিঠের বাসিন্দা গোপাল মাইতির কথায়,'মায়ের উপর বিশ্বাস করে গেলে বাঘ কিছু করে না। সবাই বিশ্বাস করেই জঙ্গলের মধ্যে মায়ের পুজো দিতে যায়। কারণ বনবিবির থান টা তো জঙ্গলের মধ্যেই। যেখানে বাঘ থাকে। কিন্তু মায়ের আশীর্বাদে বাঘ কিছু বলে না। আমরা জঙ্গলে যাওয়ার আগে কত বার বিবিমায়ের স্বপ্ন দেখেছি। মা স্বপ্নে এসে আদেশ দিতেন। আর সেই মতোই জঙ্গলে আমরা চলাফেরা করতাম। মাঝে মধ্যে যদিও খুব বিপদের মুখোমুখিও হয়েছি কিন্তু মায়ের নাম স্মরণ করে সেইসব বিপদ থেকে বেঁচে গেছি।'[২]

তবে যদিও এইসব কথার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবুও এটা আমাদের সমাজের মানুষের বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাস নিয়েই তাঁরা জঙ্গলে গেছেন, আবার জঙ্গল থেকে ফিরেও এসেছেন। বিপদে পড়লে সমস্ত ধর্মের মানুষ চিৎকার করেছেন 'মা' – 'মা' – 'মা' বলে। আর ভক্তের সেই ডাক শুনে বিবিমা তাঁদেরকে বাঁচিয়েও দিয়েছেন। রক্ষা করেছেন বাঘের কবল থেকে। যাইহোক এখানকার বিবিমায়ের এই পুজো উপলক্ষে যাত্রাগান ও অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। সবচেয়ে বড় কথা এই সমস্ত যাত্রা গানে বনবিবি দেবীর বা বিবিমায়ের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বনবিবি দেবীর মাহাত্ম্য সূচক কাহিনী নিয়ে এই সমস্ত যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয়। তবে আমাদের জেলার দুই সম্প্রদায়ের মানুষ অর্থাৎ হিন্দু - মুসলিম উভয়েই পুজো করে থাকে। হিন্দু – মুসলিম নির্বিশেষে এখানে প্রত্যেকের বিশ্বাস বনদেবীকে পুজো করলে বাঘ, কুমীর, সাপ বা হিংস্র জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই এই দেবীর প্রতি সবার খুব বিশ্বাস। তাই খুব বিশ্বাসের সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে এই পুজো হয়ে থাকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় বা সুন্দরবনে।

ওলাবিবি

আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বনবিবি দেবীর মতো এমন আরও অনেক বিবিমা আছেন। তবে তা মোট কতজন বিবিমা আছেন তা কেউ সঠিক করে বলতে পারেন না। সেই সংখ্যা কেউ বলেন সাত, কেউ বলেন নয়, আবার কেউ বলেন একুশ। তবে সংখ্যা যা পারে হোক, সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো - এই সমস্ত বিবিমায়েদের নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন রোগের নামানুসারে। যেমন ওলাওঠা রোগের নামানুসারে ওলাবিবি। এছাড়া এরা হলেন বনবিবি দেবীর মতো রক্ষাকারী দেবী। এদের মধ্যে কয়েকজনের কথা এখানে তুলে ধরা হলো। প্রথমে আসা যাক ওলাবিবির প্রসঙ্গে। ওলাবিবি হলেন ওলাওঠা রোগের দেবী। ইনি আবার আসানবিবি নামেও পরিচিত। কারণ ওলাবিবি ওলাওঠা রোগের তীব্র যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে সবাইকে আরাম দেয় বা আসান করে। তাই তিনি আসানবিবি। ওলাবিবি সাধারণত স্নেহপরায়না দেবী। যে কারণে আমাদের সমাজে তাঁর অনেক থান দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের অঞ্চলে ওলাবিবির থান যেমন প্রচুর তেমনি এউ দেবীকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয় নানান পালাগান। আমাদের কাকদ্বীপ, নামখানা, জয়নগর, করঞ্জলি, বারুইপুর প্রভৃতি স্থানে নানান থান আছে। তবে সব থানে যে দেবীর মূর্তি পুজো হয় তা নয়। কোথাও কোথাও মাটির বেদীর উপর বা ইঁটের বেদীর উপর পুজো হয়। যে বেদী গুলো দেখতে অনেকটা ছোট ছোট স্তম্ভক আকৃতির। ঢিবিগুলো অনেকটা উপুড় করা অর্ধবল বা নারিকেলের মালার মতো। ওলাবিবির কিছু কিছু থানে ওলাবিবি ও ঝোলাবিবি অর্থাৎ এই দুই বোনকে একসাথে থাকতে দেখা গেছে। দুই বোন কোন কোন থানে লক্ষ্মী সরস্বতীর মূর্তির ন্যায় সুসজ্জিত থাকে, কোথাও আবার খানদানী মুসলিম কন্যার পোশাকে সজ্জিত থাকতে দেখা যায়। কোথাও আবার দেবীর কোলে সন্তান থাকতেও দেখা গেছে। তবে ওলাবিবির কোন বাহন নেই।[১]

ওলাবিবির পুজো দুভাবে হয়। হিন্দু এলাকার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ পুজো করেন। আর মুসলিম এলাকার ক্ষেত্রে পুজো করেন মীর সাহেব। অর্থাৎ দুই সম্প্রদায়ের মানুষ ভক্তিভরে এই দেবীর পুজো করেন। এটাই আমাদের জেলার একটা বিশেষত্ব। যা অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। দেবীর নৈবেদ্য হিসেবে থাকে চিনি, বাতাসা, গুড়, ফলমূল ইত্যাদি। হিন্দু এলাকার থানে ওলাবিবির পুজোর ক্ষেত্রে গঙ্গা জল ব্যবহৃত হয় কিন্তু মুসলিম এলাকাতে তা দেখতে পাওয়া যায় না। তবে যে সমাজে যেভাবে পুজো হোক না কেন,

ওলাবিবির পুজো হয় সাধারণত প্রতি মাসের শুক্লপক্ষে। বিশেষ করে ব্যাপক ভাবে দেবীর পুজো হয় বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাসে।

সাতবিবি

সাতবিবির পুজোকে কেন্দ্র করে আমাদের লোকসমাজে নানান সংস্কার বা ধর্মাচরণ পালিত হতে দেখা যায়। সাতবিবির পুজোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কার বা প্রথা হলো বনভোজন। সাধারণত পুজোর দিনেই বনভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া পৌষ মাসের যে কোন দিন সাতবিবির থানে বনভোজনের ব্যবস্থা থাকে। আর এই বনভোজন হয় সাধারণত পাড়াভিত্তিক। তবে যেদিন যে পাড়াতে বনভোজনের ব্যবস্থা থাকে সেই পাড়ার কোন এক মহিলা ব্রতিনী উপবাসে থেকে রান্না করেন। সবাইকে খাইয়ে তবেই তিনি অন্ন বা প্রসাদ গ্রহণ করেন। বনভোজনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্পৃতির চিত্র খুব সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। সাতবিবির পুজো উপলক্ষে আমাদের জেলার বারুইপুরের রাধাবল্লভপুরের বনভোজন খুব জাঁকজমকপূর্ণ হয়। অনেক মানুষের সমাগম হয়।[২]

দরবারবিবি

রাজদরবারে গিয়ে দেবী রাজাকে ছলনা করে নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন তাই তিনি আমাদের লোকসমাজে দরবারবিবি নামে পরিচিত। আওরাজবিবির মতো এই দেবীও সন্তানহীনকে সন্তান দান করে। তাছাড়া এই দেবী আরেকটি কারণেও বিশেষ পরিচিত। তা হলো, তিনি আশীর্বাদ করলে ভক্তের লক্ষ্মীলাভ ঘটে। তবে তিনি রেগে গেলে শাস্তি প্রদান করেন বেইমান মানুষকে। যে কারণে দরবার বিবির পালাগানে আমাদের লোকসমাজের একটা সুন্দর চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায়। পালাগানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয় এখানকার মানুষের আচার - আচরণ, জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি, ভাষা ইত্যাদি। এছাড়া এখানকার নদ নদী, জল জঙ্গল এগুলোর চিত্র তো আছেই।[৩]

আমাদের সুন্দরবন অঞ্চলে উপরিউক্ত বিবিমায়েদের পুজো ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মসমণ্বয়ী দেবদেবীর পুজো করা হয়ে থাকে। ধর্মসমণ্বয়ী দেবদেবী বলতে সাধারণত মিশ্র সংস্কৃতি জাত দেবতাকে বোঝান হয়। আমাদের সমাজে এমন অনেক মিশ্র সংস্কৃতি জাত দেবতার পুজো দেখতে পাওয়া যায়। তবে শুধু আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে এই সমস্ত ধর্ম সমণ্বয়ী দেবতার পুজো দেখতে পাওয়া যাবে।[৪] দেখতে পাওয়া যায় তাদের ধর্ম সমণ্বয়ী মূর্তীও। যেমন:

আসানবিবি	ওলাবিবি	মানিকপির
শ্যামাকালী	কৃষ্ণকালী	হরিহর
ব্রহ্মা - বিষ্ণু মহেশ্বর	বাবানগাজি	সত্যপির
অর্ধনারীশ্বর	ছাবালপির	খোকাপির
বনবিবি	বড়পির সাহেব	রক্তানগাজি

তবে মুসলিম সমাজ মূর্তি পূজাতে বিশ্বাসী নয়। তবুও যে সমস্ত মুসলিম মানুষ আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে বসবাস করে তাদের মধ্যে অনেকেই মূর্তি পূজাতে বিশ্বাস করে। কারণ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে নানান দুরারোগ্য রোগের জন্য ভালো ডাক্তার পাওয়া যায় না। এছাড়াও সুন্দরবন অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা তো আছেই। যে কারণে এখানকার মানুষ শুধুমাত্র ডাক্তারের ওপর নির্ভরশীল না

থেকে লোকদেবতার থানে গিয়ে মানত করে মুক্তি পেতেন। ঠিক তেমনিভাবে, মুসলিম সমাজ ও হাজত দিতে শুরু করেন এই সমস্ত দূরারোগ্য ব্যধি থেকে মুক্তি পেতে। ফলে আমাদের অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। হিন্দু দেবদেবীকে ইসলামি মোড়কে আবৃত করে হাজত দিতে শুরু করেন মুসলিম সমাজের মানুষেরা। যে সমস্ত দেবদেবী মুসলিম মোড়কে আবৃত করে নতুন নামকরণ করা হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,

হিন্দু দেবদেবী	**মুসলিম পিরপিরাণী**
বালকৃষ্ণ	ছাবালপির / খোকাপির
মহাদেব	বড়পিরসাহেব / গাজিসাহেব
সত্যনারায়ণ	সত্যপির
দক্ষিণরায় ও কালুরায়	মানিকপির ও গজপির
মা শীতলাদেবী	আসানবিবি
ওলাইচণ্ডী	ওলাবিবি
নারায়ণী, বনচণ্ডী, বনদুর্গা	বনবিবি
রক্তবর্ণ পঞ্চানন্দ	রক্তানগাজী

তবে শুধু এই সমস্ত দেবীর কথা বা বলি কেন, বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব প্রসঙ্গেও একই কথা বলা যেতে পারে। বিশেষ করে দুর্গা পুজোর মূর্তি ভাবনার ক্ষেত্রে সমন্বয়ীর চিত্র উঠে এসেছে। কারণ দেবী দুর্গার সামনে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ মূর্তির ক্ষেত্রে প্রতিফিলত হয়েছে এক সুন্দর ভাবনা। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক মা বাবা চায় তার ছেলে মেয়েরা বিদ্যা - বীরত্ব - সম্পদ এবং বিঘ্নহীন সিদ্ধিলাভ করে। যা মা দুর্গার চার ছেলে মেয়ের মাধ্যমে দেখান হয়েছে। সেইসঙ্গে মা দুর্গার মাধ্যমে এবং দেবাদিদেব মহাদেবের মাধ্যমেও প্রতিফলিত হয়েছে এক সুন্দর চিত্র।[৫] নিম্নে সূত্রাকারে তা তুলে ধরা হল,

মা দুর্গা	আদি প্রকৃতি / মহাশক্তি
শিব	আদি পুরুষ
সরস্বতী	বিদ্যার প্রতীক
লক্ষ্মী	সম্পদের প্রতীক
কার্তিক	বীরত্বের প্রতীক
গণেশ	বিঘ্নহীন সিদ্ধির প্রতীক

সুন্দরবন অঞ্চলে আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, এখানকার সমস্ত ধর্মের মহিলারা বা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত গরীব পরিবারের মহিলারা জীবিকা উপার্জনের তাগিদে প্রায় একই রকম কাজ করে। অর্থাৎ কাজের ক্ষেত্রে এখানে ধর্মাধর্মের কোন ভেদ নেই। এটাও আমাদের সমাজে ধর্মসমণ্বয়ী ভাবনার সুন্দর এক চিত্র। এখানকার বাড়ির বউ ঝিয়েরা চাষের কাজে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করেছে। তবে বাড়ির বউ ঝি বলতে সাধারণত তপসিলি জাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের মেয়ে বা মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েদের লক্ষ্য করা গেছে। তবে এই ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের তপসিলি উপজাতিভুক্ত মেয়েদের বেশি দেখতে পাওয়া যাবে। যেমন মাঠে বীজ বোনা, ধান কাটা, মাটি কাটা, চাষের জমিতে ঘাস মারা, জমির বাঁধ মেরামত করা, ধান কেটে বাঁধা, ধান ঝাড়া, গাদা দেওয়া, ঢেঁকিতে ধান ভাঙা, মাথায় করে ধান বাজারে নিয়ে যাওয়া,

বাজারে বিক্রি করা ইত্যাদি কাজে এখানকার মেয়েদেরকেও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েরাও জীবিকা উপার্জনের তাগিদে এসব কাজ বেছে নিয়েছে। তবে এখানকার মেয়েরা যে শুধু চাষের কাজে যুক্ত থাকে তা নয়। তারা কেউ কেউ কাঁকড়া ধরার কাজে যুক্ত, মাছ ধরার কাজে যুক্ত, কেউ বা যুক্ত থাকে মধু সংগ্রহের কাজে, জঙ্গলের গাছ কাটার কাজে। অনেকে নদীতে বাগদা মাছের ছোট ছোট মীন ধরে বিক্রি করেও জীবিকা উপার্জন করে থাকে। নদীর ধারে যেসব মানুষের বাড়ি তাদের পরিবারের অনেক মেয়েদের নদীতে লবন সংগ্রহ, পশুপালন করতে দেখা যায়। কেউ কেউ আবার মাদুর বোনে, বিড়ি বাঁধে, গোরুর গোবর দিয়ে ঘুঁটে বানিয়ে জ্বালানির জন্য বাজারে গিয়ে বিক্রি করে। কেউ বা ধনী মানুষের বাড়িতে বারোমেসে কাজ করে, কেউ বা লঙ্কা তুলে দেয়, কড়াই তুলে দেয় ধনী পরিবারে যার বিনিময়ে পয়সা পায় তারা। কেউ বা আবার বাড়িতে বসে দেশি মদ বানায়, মদ বিক্রি করে। এই সমস্ত কাজে এখানকার মেয়েরাও যুক্ত। তবে এখানকার মেয়েরা খুব সহজ সরল হয়ে থাকে। ফলে এখানকার মেয়েদের সরলতার সুযোগ নিয়ে অনেকে মেয়েদেরকে বিক্রি করে দেয় বা পাচার করে দেয় ভিন রাজ্যে। কাউকে আবার বানিয়ে দেয় যৌনদাসী। ধর্মসমণ্বয়ী ভাবনার পাশাপাশি এসব চিত্র ও দেখতে পাওয়া যাবে।

তথ্যসূত্র:

1) ড. দেবব্রত নস্কর; সুন্দরবন সভ্যতা ও লোকসংস্কৃতি অন্বেষণ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃ – ২৭৯ – ২৮৬।
2) ড. দেবব্রত নস্কর; চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী; পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ – ৩৪৯- ৪২৩।

3) সনৎ কুমার নস্কর ও ছন্দা রায় সম্পাদিত ‘সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবন সাহিত্য ও সংস্কৃতি , ২০০৯, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ - ৭২।
4) দীপঙ্কর মল্লিক ও দেবারতি মল্লিক সম্পাদিত ‘তবু একলব্য’, ভলিউম - ৪১, পৃ - ৭২২- ৭৩০।
5) ড. দেবব্রত নস্কর, সুন্দরবন সভ্যতা ও লোকসংস্কৃতি অন্বেষণ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃ - ৮৫ - ৯৫।

সাক্ষাৎকার:

1) সমীর মোল্লা, বয়স ৪২, পেশা - কৃষিকাজ, জয়নগর মৈপিঠ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।
2) গোপাল মাইতি, বয়স ৪৮, পেশা - কৃষিকাজ, জয়নগর মৈপিঠ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।

গ্রন্থপঞ্জি:

1) বরুণ কুমার চক্রবর্তী; বাঙলার লোকসংস্কৃতি, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউশন, কলকাতা, ২০১৩।
2) গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু; বাংলার লৌকিক দেবতা, দেজ, কলকাতা, ২০০৮।
3) পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংখ্যা, ১৪০৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
4) লোকায়ত সুন্দরবন, সুভাষ মিস্ত্রী, লোক প্রকাশনা, বিবেকানন্দ পল্লী, সোনারপুর, কলকাতা - ১৫০।
5) ড. কুমুদরঞ্জন নস্কর, ম্যানগ্রোভ অরণ্য ও আমরা, সমকালের জিয়নকাঠি।
6) D. Ashutosh bhattacharya, Banglar loksongskriti, national book trust India, Kolkata, publish 1965.
7) Rabindranath Tagore, lokosahitya, reflect publication, Kolkata.